পাঠক ফোরাম

সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আমরা

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য একটা জাতির বা সমাজের পরিচয়ের অন্যতম মাপকাঠি। এ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধরে রাখার দায়িত্ব পালন করে প্রতিটি প্রজন্ম। যাদের ধৈর্যশীল, উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তির মাধ্যমে বিকশিত হয় সভ্যতার উৎকর্ষতা। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতির কি অবস্থা! আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মাঝে অন্যের পদচারণা তো আমাদের বিমর্ষ করে না! করে কি? যারা সচেতন, তারাও কি আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পরিবর্তনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারছেন? আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন যারা আধুনিকতার নামে সবকিছুর পরিবর্তনে বিশ্বাসী। একটা বিষয় নিয়ে তারা বেশি দিন থাকতে চান না। তবে যেখানে শালীনতা থাকে না, সেখানে ভদ্র কোনো আধুনিক মানুষ তৈরিও ফলপ্রসূ হয় না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে নিজেদের ছোট করার অপসংস্কৃতিই বিনষ্ট করছে আমাদের। অতএব, আমরা রক্ষণশীল হই, নিজের বলে জাহির করার মতো কিছু থাকুক আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে।

আশরাফুল আলম
মওলানা ভাসানী বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়, সন্তোষ, টাঙ্গাইল

একের পর এক বোমা হামলায় দেশটার কী হবে

বাংলার আকাশে, বাতাসে, ভূমিতে ও ভূমির গভীরে আজ মহাদুর্যোগের ঘনঘটা। বোমা, গ্রেনেড আর বুলেটের গর্জনে কম্পিত আজ দেশ। ক্ষতবিক্ষত আজ জননীর শরীর। বোমা ফুটছে, রক্ত ঝরছে। গ্রেনেড ফুটছে, রক্ত ঝরছে। বুলেট বিঁধছে, রক্ত ঝরছে। কিন্তু ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত বইছে যে দেশের বুকে সে দেশে আর কেন রক্ত ঝরবে? কারা করছে এসব? কী উদ্দেশ্যেই বা করা হচ্ছে। হিকমতুল জেহাদ নামটা কী ভয়ঙ্কর! এ নামের আড়ালেই কী সব লুক্কায়িত। নাকি এসব নাম শুধু বিভ্রান্তির জন্য? ব্রিটিশ নাগরিক ও পার্থ সাহাকে গ্রেপ্তার বা তিন এমপিকে অনুসরণ কিংবা অযথা কিছু মানুষের হয়রানি বা আবেগী বেফাঁস খুনসুটি নয়। আমরা এ হত্যাসহ সব হত্যাকান্ডের মূল হোতাদের বিচার চাই এবং সেই সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অর্ধমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। আমাদের জান-মালের নিরাপত্তাদানে ব্যর্থ ভুয়া গোয়েন্দা ও পেটুয়া বাহিনীর কঠোর শাস্তি চাই। এই বাংলায় কী তাহলে বোমা, গ্রেনেড আর বুলেটের ভয়ে গির্জায় প্রার্থনা, বটমূলে বর্ষবরণ, মসজিদে ও মাজারে ইবাদত, সমাবেশ ও মিছিল হবে না? বাঙালি বীরের জাতি- এ গৌরব কী তাহলে হায়েনা আর মীরজাফরদের দাপটের কাছে হার মানবে? এই বাংলায় নেতা-নেত্রী কিংবা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ- কারও আজ নিরাপত্তা নেই। নেই স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা। কিন্তু কেন? কে দেবে এ প্রশ্নের জবাব? অশুভ শকুনেরা আজ খুবলে খেতে চায় এ দেশকে। মীরজাফরের প্রেতাত্মারা আজ বিষ ছড়াচ্ছে আমাদের চারপাশে। স্বাধীনতা আজ হীনতায় ভুগছে। গণতন্ত্র আজ গণমরাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। আওয়ামী লীগ-বিএনপি সব আমলেই বোমা ফুটছে। কারা ফোটাচ্ছে, কেন ফোটাচ্ছে তার কূল-কিনারা করতে পারছে না কেউ। আমরা নিরীহ জনগণ শুধু অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছি।

ম. শওকত আলী
২১/১ জিগাতলা, ঢাকা

বিশ্বের ক্ষমতাবান মহিলা

বিশ্বের ক্ষমতাধর ১০০ জন মহিলার তালিকা প্রকাশ করেছে সম্প্রতি সিঙ্গাপুরের একটি পত্রিকা। সেই রিপোর্ট থেকে এশিয়া এবং ওসেনিয়া অঞ্চলের ক্ষমতাবানদের চিত্র তুলে ধরেছে মালয়েশিয়ার The New Staits Times দৈনিক পত্রিকাটি। উল্লেখ্য, কন্ডোলা রাইচ হচ্ছেন বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাবান মহিলা। এরপর আছেন চীনের একজন ব্যবসায়ী। সোনিয়া গান্ধীর অবস্থান তৃতীয়। এবং এটাও বলা হয়েছে যে তিনি (সোনিয়া গান্ধী) পর্দার অন্তরালে থেকেই তৃতীয়। লরা বুশ এবং হিলারি ক্লিনটন দু'জনের অবস্থানই ৪র্থ। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী ৮ম। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট গ্লোরিয়া মাহাপাগাল আরোরো ৯ম। মিয়ানমারের বিরোধীদলীয় নেত্রী অং সান সুকি ৪৩ তম। শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা ৪৪তম। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হেলেন ক্লার্ক ৪৫তম। এখানে আমাদের জন্য সুখবর হলো, বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ক্ষমতার অবস্থান বিশ্বে ১৪তম।

Monir
Port Klang, Malaysia

রাজনৈতিক কালচার

বাংলাদেশের রাজনীতি বাংলা সিনেমার মতো। কিংবা বাংলা সিনেমার মতো বাংলাদেশের রাজনীতি। একই তো...
বাংলা সিনেমার কাহিনী যেমন- নায়ক গরিব, নায়িকার বাবা হ্যানত্যান তারপর টিসুম! শেষে মিল মহব্বত...
সেরকম বাংলাদেশের রাজনীতি। এক সরকার এল। বিরোধী দল প্রথম থেকেই কারচুপি, নির্বাচন মানি না, সরকার পতন ইত্যাদি কথা বলে বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা শুরু করবে। সরকারি দল বিভিন্ন উন্নয়নের প্রশ্নে বিগত সরকারের দোষ দিতে দিতে ৫ বছর পার করবে। আর যাওয়ার সময় আমাদের 'কচু হাতি ঘন্টা' দিয়ে যাবে। এটাই এখন রাজনীতির কালচার।
১৯৮৭ সালে প্রকাশিত অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসের বাংলাদেশ : এ লিগ্যাসি অব ব্লাড অবলম্বনে 'বাংলাদেশ একটি রক্তাক্ত দলিল' বইটি পড়লাম কিছুদিন আগে। পড়ার পর মনে হলো, বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের শ্রদ্ধা করা একটা চরম বোকামি। আমাদের দেশের ভিত্তিটা নড়বড়ে, তাই সবাই এ দেশকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করছে। আমরা সবাই একেকটা অথর্ব। আমরা সব অথর্বের দল ভুলে যাই আওয়ামী ও বিএনপি দুই প্রধান রাজনৈতিক দলই দেশদ্রোহীদের সঙ্গে কোয়ালিশন করেছিল। তবুও আমরা তাদেরই দেশ চালানোর দায়িত্ব দিচ্ছি। আমি স্বীকার করি আমি অথর্ব, বোকা, থার্ড ক্লাস... কিন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবীরা; তারা নিজেদের অবস্থান নিয়ে কতটা সোচ্চার?

ফারাহ্ নাজ মুন
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
famonictg@yahoo.com

কি হবে এ দেশের

দোকানের টুকটাক ফাই ফরমায়েশ খাটার জন্য একটি ছোট ছেলে দরকার। সে রকমই একজনকে বললাম, 'এই দোকানে কাজ করবি?' পাল্টা প্রশ্নে সে জিজ্ঞাসা

এত ধর্মঘট কেন

কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতাদের মুখের কথায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে দিনের পর দিন। ক্ষমতার লোভ, দলীয় স্বার্থ উদ্ধার কিংবা প্রতিশোধস্পৃহা থেকেই তারা ডাক দেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট। অন্যায় ধর্মঘট টিকিয়ে রাখার জন্য আনা হয় বহিরাগত অছাত্র সন্ত্রাসীদের। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যাতে মাথা তুলতে না পারে, যাতে ঝিমিয়ে থাকতে বাধ্য হয় তার জন্য আনা হয় সন্ত্রাসীদের, যারা কথা বলে অস্ত্রের ভাষায়। অতীতের ধর্মঘটগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে খুব কম সংখ্যক ধর্মঘটই ছাত্রদের মৌলিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সংঘটিত হয়েছে। কয়েকটি ধর্মঘট ছাড়া প্রতিটি ধর্মঘট হয়েছে নেতাদের দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। রাজনৈতিক দলগুলোর একে অপরের সঙ্গে টানাপড়েন সম্পর্ক, চাঁদাবাজি করতে গিয়ে ছাত্রনেতা গ্রেপ্তার, তার মুক্তি দাবি, মামলার আসামির মামলা থেকে অব্যাহতি দাবি, সন্ত্রাসী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করায় আহত ফলে সুষ্ঠু বিচার দাবি, ক্যান্টিন কিংবা হলে ফাউ খাওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব এবং তার সমাধান দাবি প্রভৃতি ছাত্র স্বার্থবহির্ভূত অপ্রয়োজনীয় দাবিগুলোই হচ্ছে ধর্মঘটের মূল কারণ। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতাদের শিক্ষা জীবন জরিপ করলে দেখা যাবে তারা ১০-১৫ বছর ধরে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স করছেন। কারণ তারা ক্লাস ও পরীক্ষায় নিয়মিত নন। ক্লাস ও পরীক্ষায় অনুপস্থিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে তারা সাধারণ ছাত্রছাত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন। সুতরাং ছাত্রদের প্রয়োজনীয় দাবি কী, এটা সম্মানিত ছাত্রনেতারা কি করে বুঝবেন? ছাত্রদের দাবি আদায়ের জন্যই যদি ধর্মঘট হয় তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাহারা দিয়ে বন্ধ করে রাখা কেন? শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা অবস্থায় উত্তাল ছাত্র সমাজ তাদের দাবি আদায় করে নেবে যেভাবে করেছিল বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে।

মু. কাইসার রহমানী, মিরপুর, ঢাকা, ই-মেইল : prov_a@yahoo.com

করল, 'কত দিবেন?' খাওয়া-দাওয়া ও প্রতিদিন দশ টাকা বলতেই সে বলে উঠল, 'ওটা তো এক বোতল বিক্রি করলেই পাওয়া যায়।' মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল এই ভেবে, বলে কি ছেলে! রংপুরের কলেজ রোড এলাকার মাদক ব্যবসায় প্রভাবিত এক ছোট ছেলের কথা বলছি।

কলেজ রোড এলাকার মাদক বিক্রেতারা এখন তাঁদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য এসব কোমলমতি শিশুদের ব্যবহার করছে, যাদের বয়স ১২-১৫। মাদকসেবীরা নির্ধারিত স্থানগুলোতে এসে নির্দিষ্ট শিশুকে টাকা দিলেই সে পুলিশসহ সবার চোখ এড়িয়ে ফেন্সিডিল, হেরোইনসহ বিভিন্ন ধরনের মাদক দ্রব্য এনে দিচ্ছে। বিনিময়ে প্রতি বোতল ফেন্সিডিলে সে পাচ্ছে দশ টাকা কমিশনসহ মাদকসেবীর কাছ থেকে বখশিশ। বাংলাদেশের একটি মাদক আস্তানার চিত্র দেখেই সারা দেশের অবস্থা আঁচ করা যায়, ফলশ্রুতিতে আজকের এই শিশু বাংলাদেশের জন্য অন্ধকার ভবিষ্যৎ হয়ে দেখা দিতে বাধ্য। এসব নিয়ে কি আমাদের রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ ভাবেন? তারা কি এর কোনো সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারবেন?

মামুন
কলেজ রোড, রংপুর

বর পায় 'জামাই আদর' কন্যা কেন পায় না 'বৌ আদর'

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের গুরুত্ব মেয়েদের থেকে অনেক বেশি। পুরুষ মানুষ সংসারে যতো অন্যায়ই করুক না কেন, তার 'সাত খুন মাফ'। কিন্তু মেয়েদের বেলায় তা হয় না। আমাদের সমাজ সংসারে এখনও মেয়েকে বাবা-মায়ের বোঝা হিসেবে দেখা হয়। কন্যার পিতাকে বলা হয় 'কন্যাদায়গ্রস্ত' পিতা। কিন্তু সংসার পরিচালনায় মেয়েদের ভূমিকা অনেক বেশি। একটি মেয়ে বাবা-মায়ের ঘরে সতেরো-আঠারো বছর প্রতিপালিত হওয়ার পর বৌ হয়ে অন্যের ঘরে আসে। মেয়েটিকে ছেড়ে আসতে হয় তার সব আত্মীয়স্বজন, পরিবেশ, চেনা-জানা সব কিছু। একটি নতুন পরিবেশে এসে তাকে সব কিছু নতুনভাবে গ্রহণ করতে হয়। কখনও ভালো আত্মীয়স্বজন পায় আবার কখনও পায় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েদের নতুন জায়গায় চরম প্রতিকূলতার মধ্যে চলতে হয়। এরপর আসে মা হবার সময়। একটি মেয়ে যখন মা হয় তখন তার যে কষ্ট তা ছেলেরা কোনো দিনই অনুভব করতে পারে না। সন্তান হবার পর তাকে (সন্তানকে) প্রতিপালন করা এক দুরূহ ব্যাপার। তখন স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকদের সহযোগিতা না পেলে মায়ের ভীষণ কষ্ট হয়। মা'র সঙ্গে পৃথিবীর কোনো কিছুরই তুলনা হয় না। একটি মেয়েকে বিয়ের পর যত ঝামেলা পোহাতে হয়, সেক্ষেত্রে ছেলেদের তেমন কিছুই সহ্য করতে হয় না। কিন্তু তারপরও বর সাহেবকে শ্বশুরবড়িতে জামাই আদর দিতে হয়। জামাই'র আদর-যত্নে কোনো কমতি দেখা দিলে তার ফল ভোগ করতে হয় মেয়েকে। জামাই বাবাজী কিন্তু কোনো এক মায়েরই সন্তান। জামাইকে এতো আদর-যত্ন করার প্রয়োজন হয় কেন? সে সংসারে আয় করে বলে কি? কিন্তু আজকাল বহু মেয়ে ছেলেদের থেকে কম আয় করে না। সব বিবেচনায় সংসারে বৌদের অবদান জামাইদের তুলনায় কম নয়, বরং বেশি। তাই জামাই আদরের পাশাপাশি সমাজ সংসারে 'বৌ-আদর'ও করতে হবে। ব্যাকরণ বইতে 'জামাই আদর'-এর সঙ্গে সঙ্গে 'বৌ-আদর' বাগ্‌ধারাটিও থাকতে হবে। গুণীজন বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে আশা করি।

কবিতা চাক্‌লাদার
চৌমুহনী, নোয়াখালী

দৃষ্টি আকর্ষণ

লোকসানি বীমা কোম্পানি চিহ্নিত করতে হবে

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, 'লোকসানি বীমা কোম্পানি চিহ্নিত করতে বিশেষ অডিট হচ্ছে'- (ইত্তেফাক ২৮ আগস্ট '০৪)। বীমা গ্রাহকগণ সাধারণ বীমায় যে পলিসি করেন তার মেয়াদকাল এক বছর। প্রতি বছরই নতুনভাবে আবার চুক্তি করতে হয়। কিন্তু জীবন বীমাতে বীমা গ্রাহককে একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে হয়। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হবার পর পলিসি ম্যাচুরিটি (Maturity) হলে তখন বীমার অর্থ পাওয়া যায়। পত্রিকার খবর দেখে গ্রাহকরা খুবই চিন্তান্বিত। কোম্পানিগুলো যদি লোকসান দিতে দিতে দেউলিয়া বা বন্ধ হয়ে যায় তখন গ্রাহকদের কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং ডাক জীবন বীমা রয়েছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে অনেকগুলো জীবন বীমা কোম্পানি খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সরকার অনুমতি দিয়েই খালাস। এগুলো কিভাবে চলছে, কেমন চলছে এতো বছর তার কোনো খোঁজই নেয়া হলো না। বীমা নিয়ন্ত্রকের অফিসও নীরব, নিশ্চুপ। বীমা কোম্পানিগুলো উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সরকারি প্রতিষ্ঠান জীবন বীমা কর্পোরেশনের উর্ধ্বতন অফিসারদের থেকে কয়েকগুণ বেশি বেতন দিচ্ছে। উল্লেখ্য, কোম্পানিগুলোতে অফিসার কর্মকর্তাদের কোনো সমন্বিত বেতন কাঠামো নেই। এছাড়া বিভিন্ন খাতে (স্টেশনারি, ভ্রমণ, বিদেশ ভ্রমণ, আপ্যায়ন) ব্যয় হচ্ছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বোর্ডের কর্মকর্তাগণও পিছিয়ে নেই। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বেতনের নামে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ এবং অন্যান্য অপব্যয়ের জন্য অনেক কোম্পানি আজ বিপদের সম্মুখীন। যেদিন ম্যাচুরিটি (Maturity) দাবি পরিশোধ করা শুরু হবে সেদিন অনেক কোম্পানিই ধসে যাবে।

জাহাঙ্গীর চাক্‌লাদার, লালবাগ, ঢাকা

সাবাস ২০০০!

গত তিন সংখ্যায় সাপ্তাহিক ২০০০ তিনটি সাহসী প্রতিবেদন করেছে; বিজনাস ডট কম, মুসা বিন শমসের ওরফে নুলা মুসা এবং গ্রেনেড হামলা নিয়ে 'তদন্ত তদন্ত খেলার' ওপর। অসম্ভব সময়োপযোগী প্রতিবেদন। এজন্য প্রথম থেকেই আমরা আছি এবং থাকবো ২০০০-এর সঙ্গে। প্রসঙ্গত, দু-একটি কথা বলতে চাই। সমাজের যেসব অসঙ্গতি, দুর্নীতি বা পচে যাওয়া লোকদের নিয়ে ২০০০ প্রতিবেদন করছে সেগুলো কিছুদিন পর পর ফলোআপ করা উচিত। তাতে করে পাঠক যেমন সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকবে, তেমনি সেই ব্যক্তি বা সংস্থা এবং সরকার কিছুটা হলেও চাপের বা জবাবদিহিতার মুখে থাকবে। যেমন রুবেলের হত্যাকারী এসি আকরাম কিংবা সিদ্ধেশ্বরীর সেই কাস্টমস্ অফিসার জহুরুল হক- যার বাসা থেকে ২ বস্তা টাকা পাওয়া গিয়েছিল তারা এখন কি অবস্থায় আছে সেটা জানতে পাঠক নিশ্চয়ই আগ্রহী। এ জাতীয় প্রতারক সংস্থা বা ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজদের এক এক করে ২০০০ পাঠকের কাঠগড়ায় আনতে পারে। একটি দেশের রাজধানীকে আমরা ছিনতাই, চাঁদাবাজিমুক্ত করতে পারছি না- একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। যদি সরকার চায় তবে সম্ভব। যেমন ক্লিন হার্ট অপারেশনের সময় ঢাকা শহর ছিনতাইকারী, চাঁদাবাজমুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ সেনাবাহিনী সৎ এবং স্বাধীনভাবে তাদের কাজ করতে পেরেছে। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে পুলিশও এটা পারে। বিএনপি ক্ষমতায় এসেছিল একটি মাত্র মূল ইস্যুতে- সন্ত্রাস বন্ধ। কিন্তু সেটা তো দূরের কথা, তারা বার বার বিজ্ঞাপন দিয়েও রাসেল স্কয়ার থেকে আজিমপুর পর্যন্ত রিকশাই বন্ধ করতে পারছে না, শেষ মুহূর্তে পিছু হটছে।

জিয়া হাসান, ঢাকা

চ.বিতে বৈষম্যমূলক গ্রেডিং

চ.বিতে আইন বাদে বাকি অনুষদগুলোতে গ্রেডিং চালু হলেও সব ফ্যাকাল্টিতে গ্রেডিং সিস্টেম সমান নয়। আমরা বাণিজ্য অনুষদের শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে সুবিধা বঞ্চিত হচ্ছি। কলা, বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীরা অনেক কম নম্বর পেয়েও আমাদের সমান গ্রেড পাচ্ছে। যেখানে বাণিজ্য অনুষদে ৬০ পেলে (B) সেখানে অন্য অনুষদে ৬০ পেলে (A-)। আমাদের ৭০ পেলে (A-) আর ওদের ৭০ পেলে (A)। ফলে দেখা যাচ্ছে আমাদের চেয়ে কম নম্বর পেয়েও ওদের G.P.A এবং গ্রেড আমাদের চেয়ে বেশি থাকে। এ ধরনের গ্রেডিংয়ের ফলে আমরা রেজাল্টের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে যাচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবশ্যই উচিত আমাদের বাণিজ্য অনুষদের গ্রেডিং পদ্ধতি সংস্কার করা।

রাইয়ান মাহমুদ মুন
বিবিএ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়